দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/AU24002

শিশু শিক্ষায় নীতিমালা প্রণয়নে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

(Exploring a Balanced Viewpoint in Policy-making Concerning Child Education: Bangladesh Perspective)

আহম্মদ উল্লাহ*

সারসংক্ষেপ

শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব কার কাছে থাকা উচিত এটি একটি জটিল প্রশ্ন যা নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর পর্যালোচনার দাবী রাখে। প্রশ্নটির উত্তর সরল নয় এবং এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। এ কারণেই অতীতকাল থেকে বিরাজমান বিতর্কের দার্শনিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে শিশুর অধিকার, অভিভাবকের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা ও বৃহৎ পরিসরে সম্প্রদায়ের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে উদারতাবাদ, উপযোগবাদ, সামগ্রিকতাবাদ এবং বিচারমূলক শিক্ষাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন প্রেক্ষাপটে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কার্যকর সমন্বিত মডেলের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে, পাশাপাশি তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্ব ও তার বাস্তবিক প্রভাব আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবক, রাষ্ট্র এবং শিশুর ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রবন্ধটিতে যে ভারসাম্যপূর্ণ ও শোভন দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তা সকল পক্ষের স্বার্থকে সমন্বিত করে শিশুর জন্য সেরা শিক্ষামূলক ফলাফল নিশ্চিত করতে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব তৈরি করতে সহায়ক হবে বলেই মনে হয়।

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: ahammad@du.ac.bd

[Abstract: The question of who should have the authority to make decisions about child education is a complex one which requires an intense review from moral, social, political and above all, philosophical perspectives. The answer of this question is not straightforward and there is an ongoing debate on the matter. This is why it is essential to analyze the philosophical foundations of this long-standing debate, considering children's right, parental responsibilities, the role of the state, and more importantly, the influence of the community. In this article, the issue has been reviewed based on various philosophical perspectives-such as liberalism, utilitarianism, collectivism and critical pedagogy—and a compatible and effective integrated model has been proposed to address the current crisis-ridden context of Bangladesh, along with a discussion on the necessary steps for its implementation. By discussing and analyzing the philosophical perspectives, theories as well as highlighting the practical implications of the roles of parents, the state and the children themselves in decision-making, the article presents arguments in favor of balanced viewpoint, which will be more justified and helpful to develop a compassionate mindset by ensuring best educational outcomes for children.]

কেবল জ্ঞানের রূপান্তর কিংবা হস্তান্তরই শিক্ষা নয়। এটি একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির পরিচয়, মূল্যবোধ এবং বিচারমূলক চিন্তার সক্ষমতা গড়ে তোলে। আর তাই এমন প্রক্রিয়াকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে কিংবা কে বা কারা এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার সমাধান শিশুর মানসম্মত এবং সময়োপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত জরুরি। অতি প্রয়োজনীয় এ প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কর্তৃত্বের সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথমত, এ কর্তৃত্ব কি শিশুর পিতা-মাতার, যারা শিশুর প্রতি প্রাথমিক ও প্রধান যত্নশীল নাকি সেই সমাজ এবং সম্প্রদায়ের যারা শিশুর সামগ্রিক বিকাশকে পারিপার্শ্বিকভাবে প্রভাবিত করে, নাকি নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়পরতার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তা কেবল রাষ্ট্রের, নাকি শিশুর নিজের যার স্বাধীনভাবে নিজের বিকাশকে নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে? দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রশ্নের যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের উদ্দেশ্যে সকল অংশীজনের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি পর্যালোচনা করে সকলের অধিকার ও দায়বদ্ধতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশু-স্বার্থের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান করা হয়েছে।

আলোচনার প্রারম্ভে প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য'র সাথে সঙ্গতি রেখে শিশু শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে সম্ভাব্য কার্যকর উপায় সম্পর্কে নিজস্ব পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশেষে দেশীয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য কার্যকর উপায় হিসেবে কীভাবে তা বাস্তবে রূপান্তর করা যায় সে বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ এ প্রবন্ধে অবতারণা করা হয়েছে।

(১)

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব হলো পিতা-মাতার। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অধিকার, কর্তৃত্ব কিংবা ক্ষমতার বিষয়টির ভিত্তি হলো প্রাকৃতিক আইন। প্রাকৃতিক আইন বিষয়ে যদিও অনেকেই আলোচনা করেছেন তথাপিও প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের (John Locke) কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর *"Two Treatise of Government"* গ্রন্থে বলেছেন, শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার একটি স্বাভাবিক অধিকার এবং কর্তব্য। তিনি মনে করেন, শিশু নির্ভরশীল হয়েই জন্মগ্রহণ করে তাই তার বৌদ্ধিক ও স্বনির্ভরশীল বিকাশের জন্য সঠিক তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে থেকে পিতা-মাতাই শিশুকে যথার্থ শিক্ষা প্রদানের জন্য যথাযোগ্য অবস্থানে রয়েছেন এবং তাঁদেরই প্রাথমিক দায়িত্ব শিশুর প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের দেখাশোনা এবং শিক্ষিত করার প্রাকৃতিক দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেছেন যে অভিভাবকত্বের কর্তৃত্ব অস্থায়ী এবং তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে প্রয়োগ করা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্বকে ন্যায্যতা দেয়, পাশাপাশি শিশুর ভবিষ্যৎ স্বায়ত্তশাসনের উপরও জোর দেয় (Locke, 1689)। আবার উদারতাবাদী দর্শন যা ব্যক্তির স্বায়ত্বশাসন এবং স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, মনে করে যে অভিভাবক, যারা শিশুর প্রতি প্রধান যত্নশীল তাঁদেরই শিশুর শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিভাবকদের অধিকার এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতার প্রতি অধিক জোর দেয় (Thompson, 2017)। জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) স্বাধীনতা সম্পর্কিত ভাবনা এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে, যেখানে তিনি বলেন যে ভাল জীবন নির্বাচন সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব যৌক্তিক বোধ ও স্বাধীনতা থাকা উচিত যার মধ্যে সন্তানের লালন-পালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত। তিনি *"On Liberty"* (1859) গ্রন্থে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্বকে রক্ষা করার কথা বলেছেন, তবে তিনি শিশুর প্রাথমিক বিকাশে অভিভাবকের ভূমিকাকেও স্বীকার করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কিত

সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে, যতক্ষণ না তা শিশুর ক্ষতি করে বা সামাজিক স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে (Mill, 1859)। যদিও অভিভাবকত্বের কর্তৃত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, তবে এটি অসীম নয়। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে অভিভাবকের শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা সম্পদের অভাব থাকতে পারে। এছাড়াও, শিক্ষিত নাগরিক তৈরির মতো সামাজিক স্বার্থগুলি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে অভিভাবকত্বের কর্তৃত্বকে সীমিত করতে পারে।

এটি অনস্বীকার্য যে, শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পিতা-মাতার কিন্তু শিশু শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তা হিসেবে পিতা-মাতাকে স্বীকার করলে বাস্তব প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য বৈষম্যের জায়গা থেকে কিছু সঙ্ককটকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। কেননা এসব সঙ্কট শিশুর বিকাশে বরং প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পিছিয়ে পড়া বা নানা কারণে বৈষম্যের স্বীকার হওয়া সমাজে শিক্ষার্থী তুলনামূলক দুর্বল কিংবা নিম্নমান ও অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে। এমন পরিবেশে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি মানুষ হিসেবে শিশুর অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এমনকি সামাজিক স্তরবিন্যাস শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যহত করছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এমি গাটম্যান (Amy Gutmann) বলেন, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় সকল শিশুর শিক্ষার সম-সুযোগ নিশ্চিতকরণের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাথে পিতা-মাতার কর্তৃত্বের একটি ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান প্রয়োজন (Gutmann, 1987)।

(২)

একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় নাগরিকদের দ্বারা। প্রকৃতিগত দিক থেকে নাগরিকের অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিষয়টি মূল্যায়িত হয়ে থাকে সামাজিক ন্যায়পরতা এবং সাধারণ কল্যাণ ধারণার নিরিখে। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার এমন বিষয় সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এমন নৈতিক ও বিচারবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা যারা সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম। কান্ট যুক্তি প্রদান করেন যে, কেবল পিতা-মাতার উপরই শিক্ষা নির্ভর করা উচিত নয়। কারণ তাঁরা কখনও কখনও শিশুর উন্নয়নের চাইতে নিজেদের স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিতে পারেন (Kant, 1803)। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে অন্যান্য আরও অনেকেই কান্টের ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মনে করেন শিশুর শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব ও সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রেরই উপর বর্তায়। তেমন একজন দার্শনিক হলেন মার্থা নুজবাম (Martha Nussbaum), তিনি বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। আর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ বলতে তিনি

বিচারমূলক চিন্তা, সহানুভূতি, নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়কে বুঝিয়েছেন (Nussbaum, 2010)। আবার বস্তুবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস (Karl Marx) মনে করেন, শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি আরও মনে করেন, রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার এমন নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, যাতে এটি সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে পারে। তিনি একটি শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে শিক্ষা সমাজের সকল সদস্যকে সমানভাবে উপলব্ধি করবে। আর তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন (Wingo, 1975)। অন্যদিকে সামগ্রিকতাবাদ ব্যক্তিজীবনের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং যৌথ মূল্যবোধ ও দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং এটি একইসাথে জনকল্যাণেরও বিষয়। সামগ্রিকতাবাদীগণ যুক্তি প্রদান করেন যে, রাষ্ট্রের আইনসিদ্ধ একটি দায়িত্ব হলো নাগরিকদের সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং ভূমিকাপালনকারী কার্যকর সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করা। সেদিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ঐক্য ও শিক্ষা দ্বারা নাগরিক গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। কেননা রাষ্ট্র সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Woody, 1940)। আবার সামাজিক চুক্তিবাদী রাষ্ট্র দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau) আদর্শ নাগরিক গঠনে রাষ্ট্রের সহায়ক ভূমিকাকে স্বীকার করে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেছেন (Rousseau, 1762/1979) । রুশোর মতো অন্যান্য সামাজিক চুক্তি তত্ত্ববিদগণ, যেমন থমাস হবস (Thomas Hobbes), যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ব্যক্তি সুরক্ষা এবং সাধারণ কল্যাণের বিনিময়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এই কাঠামোতে, শিক্ষার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনের মাধ্যম হিসাবে ন্যায্যতা দেওয়া হয় (Locatelli, 2024)। আবার উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিক্ষাকে এমনভাবে নিশ্চিত করা যা সামাজিক কল্যাণকে সর্বাধিক করে। এর মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক সংহতি প্রচার করা। রাষ্ট্রের শিক্ষামান এবং নীতিনির্ধারণের কর্তৃত্বকে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে ন্যায্যতা দেওয়া হয়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যে সমাজের বৈচিত্র্যকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে এবং ক্ষুন্ন করতে পারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ইতিহাসের পরিক্রমায় সে সম্পর্কে নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাছাড়া শিক্ষায় শিশুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা ভবিষ্যতের নাগরিক এবং সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি। প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের শেখার আগ্রহ, জ্ঞান অন্বেষণ এবং মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, যা তার ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে। তাদের সক্রিয় ও স্বাধীন অংশগ্রহণ ছাড়া শিক্ষার সঠিক মান এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিশুর অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতার বিষয়টিকে অস্বীকার

করার সুযোগ নেই। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মাত্রা সম্পর্কিত বিতর্ক একটি চলমান বিতর্কের বিষয়। এ বিষয়ে মতভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। কিছু মানুষ সমতা ও সামাজিক ঐক্য নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় অধিক নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে আবার অভিভাবকের কর্তৃত্ব এবং শিশুর স্বশাসন ও নির্বাচনের স্বাধীনতার পক্ষেও নানা যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। যদিও রাষ্ট্র শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তথাপিও এর কর্তৃত্ব সীমাহীন নয়। রাষ্ট্রের অত্যধিক হস্তক্ষেপ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি প্রায়শই শিক্ষায় রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার উপযুক্ত পরিসর নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে।

(৩)

সাম্প্রতিক বাস্তবতায় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিলে তারা ভবিষ্যতে একজন সফল ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। তাছাড়া দার্শনিকদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে আমেরিকান প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই (John Dewey) এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর "*Democracy and Education*" গ্রন্থে বলেন, শিক্ষা একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত যা শিশুদের বিচারমূলক চিন্তা করতে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম করে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব গঠনের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। তিনি মনে করেন, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব (Dewey, 1916)। জন ডিউই এর মতো মারিয়া মন্টেসরিও (Maria Montessori) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্বকে জোর দিয়েছেন। তিনি পদ্ধতিগতভাবেই শিশুদের এজেন্সিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং শেখার প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছেন (Montessori, 1949)। এছাড়াও হ্যারি ব্রিঘাউস (Harry Brighouse) শিশুর স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তে পিতা-মাতা এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মধ্যে শিশুর পরিবর্তনশীল সক্ষমতা অনুযায়ী একটি ভারসাম্য থাকা উচিত। তাঁর মতে, শিশুর মধ্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিণত সত্তা হওয়ার আগ্রহ রয়েছে এবং শিক্ষাগত সিদ্ধান্তগুলির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিশুর বিকাশের এমন ইচ্ছাকে সমর্থন করা (Brighouse, 2006)। আবার বিচারমূলক শিক্ষাবিজ্ঞান যা শিক্ষার মধ্যে ঐতিহ্যগত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে এমনকি অভিভাবক ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিনিধিত্বের প্রতি জোর দেয়। এক্ষেত্রে পাওলো ফ্রেইরির (Paulo Freire) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সংলাপ, বিচারমূলক চিন্তা এবং শিখন প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতি অধিক জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণ থাকা উচিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে তিনি

শিশুর শিক্ষার অধিকারকেও গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন (Freire, 1970)। এছাড়াও জাতিসংঘের (United Nations) শিশু অধিকার সনদে শিশুকে অধিাকরসম্পন্ন একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে তার শিক্ষা পাওয়ার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। এই সনদটি শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করার গুরুত্বকে তুলে ধরে যার মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও আসে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিভাবকদের চরম কর্তৃত্বের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং শিশুদের অংশীদারত্বের গুরুত্বের প্রতি জোর দেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিশুর অংশীদারত্ব ও প্রতিনিধিত্ব তার বিকাশমান স্বাধীনতার ধারণার প্রতি একরকম সম্মান প্রদর্শন এবং এটি শিশুকে বৃহৎ পরিসরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগহণের জন্য প্রস্তুত করে (United Nations, 1989)। তবে সমালোচকগণ এ বিষয়ে সতর্ক করেন যে, শিশুরা প্রকৃতিগতভাবে পূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম নয়। তাছাড়া জীবনের এমন পর্যায়ে শিক্ষাগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিপক্কতা এবং দূরদর্শিতা তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৈরি হয় না। তাই এক্ষেত্রে সঠিক ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিতা-মাতা এবং শিক্ষকের যথাযথ নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন (Archard, 2014)। যদিও শিশুদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ তবে এটি অভিভাবক ও শিক্ষকের সঠিক নির্দেশনা এবং সমর্থনের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। কেননা শিশুদের জ্ঞানীয় এবং মানসিক বিকাশ ভিন্ন হয় এবং তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সীমিত হতে পারে। এমন বাস্তবতায় তাই শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অবশ্যই শিশুদের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করার এবং উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

(৪)

শিশু শিক্ষার প্রতি সম্প্রসারিত সম্প্রদায়েরও একটি যৌক্তিক মাত্রার আগ্রহ বা কৌতুহল রয়েছে যাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ-সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় বরং তা সমাজ ও সম্প্রদায়ের মাঝেই অস্তিত্বশীল। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ ও সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। তাছাড়া শিক্ষা সহায়ক সম্পদ তথা উপকরণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সমাজ ও সম্প্রদায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিশু শিক্ষায় সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা শুধুমাত্র স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং শিশুর সামাজিক, মানসিক, শারীরিক এবং নৈতিক বিকাশে সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে শেখে এবং এই শেখার প্রক্রিয়ায় পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবৃত্ত এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যরা প্রভাব বিস্তার করে। একটি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য শিশুর শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, এমন সম্প্রদায়ে যেখানে শিক্ষা ও জ্ঞানকে মূল্যায়ন করা হয়, সেখানে শিশুরা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হয় (Vygotsky, 1978)। এছাড়া, ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচরণের চর্চা শিক্ষার মানকে সমৃদ্ধ করে।

বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক শিশুর শিক্ষাগত মান উন্নত করে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, অভিভাবক সভা এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ শিশুর মানসিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে (Epstein, 1995)। এছাড়াও সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা শিশুর শিক্ষায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থায় শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, যা মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শারীরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে (Coleman et al., 1966)। এগুলোর পাশাপাশি এটিও অনস্বীকার্য যে, শিশুরা বন্ধুদের কাছ থেকেও সামাজিক দক্ষতা, সহযোগিতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি শেখে। একটি ইতিবাচক ও সহায়ক বন্ধুবৃত্ত শিশুর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়, যেখানে নেতিবাচক প্রভাব শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে (Bandura, 1977)। শিশুর শিক্ষাগত উন্নয়নে তাই সম্প্রদায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের উৎসাহ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিদ্যালয়ের অংশীদারত্ব, অর্থনৈতিক সমর্থন এবং বন্ধুবৃত্তের ইতিবাচক প্রভাব শিশুর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কাজেই এসকল সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বলা যেতে পারে শিশু শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবার ও রাষ্ট্রের পাশাপাশি শিশু যে সমাজ ও সম্প্রদায়ের পরিবেশে বসবাস করে তাকেও একটি শক্তিশালী কর্তৃত্ব হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে।

(৫)

শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যা ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই শিক্ষা কীভাবে এবং কার দ্বারা পরিচালিত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন আজও প্রচলিত রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে অভিভাবকদেরই শিশুর জন্য প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু এটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন শিশুর স্বায়ত্বশাসন, রাষ্ট্রের শিক্ষিত নাগরিক তৈরির আগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জনগণের যৌথ দায়িত্বের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। কাজেই শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নটি একটি একক পক্ষকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং, একটি সূক্ষ্ম এবং প্রেক্ষিত-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যা পিতা-মাতা, রাষ্ট্র এবং শিশুর অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে। জন লক, কান্ট ডিউই এবং আধুনিক দার্শনিকদের তত্ত্বের আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মডেল প্রস্তাব করা যেতে পারে যা বৈচিত্র্যকে সম্মান করে, সামাজিক ন্যায়পরতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং গণতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো শক্তিশালী করতেও সহায়ক হতে পারে। ভারসাম্যপূর্ণ মডেল বলতে আমি একরকম সমন্বয়বাদী মডেলকে বোঝাচ্ছি যা বিভিন্ন মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতির প্রচার করে। এই মডেলে পিতা-মাতা তাঁদের শিশুদের শিক্ষার উপর উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব রাখতে পারেন। তবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ন্যায্যতা এবং গুণগত মানের মানদণ্ড নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর

নিয়োজিত থাকবে। একইসাথে শিশুর বয়স এবং সামর্থ অনুযায়ী পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে নিজ নিজ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্বাচন করতে পারবে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিবার ও রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো সাম্প্রতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের মতো দেশে এই মডেলকে কীভাবে কার্যকর করা যায়? বিষয়টি পরিস্থিতি বিবেচনায় জটিল হলেও অসম্ভব নয়-এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসহ বিস্তারিত প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

(৬)

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা এবং গবেষণা চলছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন, সমতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষায় অভিভাবক, রাষ্ট্র এবং শিশুদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পক্ষের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করলে একটি কার্যকরী এবং গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা গঠন সম্ভব হবে। প্রবন্ধের এ পর্যায়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হবে, কীভাবে বাংলাদেশে অভিভাবক, রাষ্ট্র এবং শিশুদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা যেতে পারে। বাংলাদেশে অভিভাবক, রাষ্ট্র এবং শিশুর অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা গঠন সম্ভব। এটি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে, যেখানে সকল পক্ষের মতামত গ্রহণ করা হবে। একটি সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করতে হলে এই তিনটি পক্ষের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের, অভিভাবকদের এবং শিশুদের ভূমিকা অপরিসীম, যা ভবিষ্যতে জাতির উনয়নে অবদান রাখবে। বাংলাদেশে শিক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবক, রাষ্ট্র এবং শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন, যা নীতিগত সংস্কার, সচেতনতা প্রচারণা এবং প্রতিষ্ঠানগত মেকানিজমকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কীভাবে অভিভাবক, রাষ্ট্র এবং শিশুদের অংশগ্রহণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা যায় তা এ প্রবন্ধে অবতারণা করা হলো:

অভিভাবকের ভূমিকা: বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং শিশুদের শিক্ষাগত পথ সুগম করতে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং তাদের সন্তানের শিখন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। তারা তাদের সন্তানদের জন্য সঠিক বিদ্যালয় নির্বাচন, শিক্ষাবিষয়ক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ এবং মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন (Okello, 2023)। তবে অনেক অভিভাবক শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নয়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ সীমিত। এজন্য অভিভাবকদের শিক্ষিত করা এবং তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে

নিয়মিতভাবে অভিভাবক সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভা আয়োজন করলে অভিভাবগণ তাদের সন্তানদের জন্য সেরা শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নিজেদের অংশগ্রহণকে সক্রিয় করতে উৎসাহিত হবে। এক্ষেত্রে সরকার এমন নীতিমালা বা আইন প্রবর্তন বা শক্তিশালী করতে পারে, যা শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবকদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও উৎসাহিত করবে। সাম্প্রতিক বাস্তবতায় লক্ষ করা যায় স্কুল পরিচালনা, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং শিক্ষা পরিকল্পনায় বিদ্যালয়কেন্দ্রিক অভিভাবকদের ভূমিকা স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ সংক্রান্ত কিছু কথা বলা হলেও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিদ্যালয়ের বাজেট নির্ধারণ, শিক্ষা কৌশল গঠন, শিক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সমস্যা সমাধানে অভিভাবকের ভূমিকা বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও নির্দেশনা নিশ্চিত করতে হবে। নীতিমালা প্রণয়নে অভিভাবক প্রতিনিধির ভূমিকাকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করতে, এ বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাষ্ট্রের ভূমিকা: রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার এবং এটি জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সরকার শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যেমন বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা, সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নত করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নতি, ইত্যাদি (Mustary, 2021)। তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডারের সুষম এবং শোভন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার আরও কতগুলো বিষয় বিবেচনায় নিতে পারে। তা হলো:

- রাষ্ট্রকে একটি সমন্বিত শিক্ষানীতির মাধ্যমে অভিভাবক এবং শিশুদের সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি জাতীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করা যেতে পারে, যেখানে অভিভাবক, শিক্ষক, শিশুদের প্রতিনিধিরা এবং শিক্ষাবিদরা শিক্ষার বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করবেন।
- রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল শিক্ষার অধিকার এবং মান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের বাস্তবতায় শিক্ষার অধিকার ও মানের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এবং দূর্গম প্রান্তিক অঞ্চলে। এ বৈষম্য দূর করতে পিছিয়ে পড়া এবং

প্রান্তিক অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা, অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল সরকারি ব্যবস্থাপনায় নয় স্থানীয় সামর্থবান শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

- গ্রামীণ ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলাকায় লক্ষ্যভিত্তিক বিশেষ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যাতে গ্রামীণ বা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অভিভাবক এবং শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। কারণ এই গোষ্ঠীগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বাধা পায়। এক্ষেত্রে গ্রামীণ এবং অবহেলিত এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার মাধ্যমে অভিভাবকদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়নে এসব সম্প্রদায়ের চাহিদা এবং বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হবে।
- বিকেন্দ্রীভূত একটি শিক্ষা প্রশাসন গঠন করা যেতে পারে। যেখানে স্থানীয় সরকার এবং কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়ন করা হবে, যাতে শিক্ষা বিষয়ে আরও প্রাসঙ্গিক ও প্রসঙ্গভিত্তিক সমাধান গ্রহণ করা যায়। পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষা অফিসে বাজেট বরাদ্দ, শিক্ষাক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শিক্ষক নিয়োগের মতো দায়িত্বের বণ্টন বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে।
- মৌলিক মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য কার্যকর মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করার ক্ষেত্রে অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সকলের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকতে পারে। এটির উদ্দেশ্য হবে এমন বিষয় বা ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা যার মানোন্নয়ন ও নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত নীতিগুলিকে আরও উন্নত করা সম্ভব হয়।
- রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে জাতীয় পরামর্শ সভা আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে প্রধান অংশীজন যেমন অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিশু অধিকার কর্মীরা শিক্ষার নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই পরামর্শ সভাগুলিতে জরিপ, টাউন হল মিটিং এবং পরামর্শক বোর্ড অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাম্প্রতিক বাস্বতায় মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সমাজের মানুষ আজ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রযুক্তির সংস্পর্শে রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্কের জন্য প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। অভিভাবক ও

শিক্ষকদের মধ্যে নিয়মিত সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম বা মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা, যেখানে তারা একে অপরের সাথে আলোচনা করতে পারে, অগ্রগতি শেয়ার করতে পারে এবং সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এছাড়াও শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া জানার জন্য অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জমা দিতে পারে, যা স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক এবং নীতিনির্ধারকদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে এবং তার ভিত্তিতে সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- সর্বোপরি দল, মত, বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতি নির্বিশেষে কেবল মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যে কমিশন নিয়মিতভাবে জাতীয় শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দশ্যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং সামগ্রিক তদারকির দায়িত্ব পালন করবে।

শিশুর ভূমিকা: শিশুর শিক্ষা সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্ত শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কেননা শিশুর তার জীবন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে, তার মধ্যে অন্যতম তার শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে যথাযথ ও যৌক্তিক অংশীদারত্ব এবং প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে শিশুদের অধিকার এবং স্বাধীনতা নিয়ে অনেক দার্শনিক আলোচনা হচ্ছে এবং সেসব আলোচনায় শিশুরাও যে তাদের শিক্ষার সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শিশুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য তাদের মতামত শোনা এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণীতে শিশুর ভূমিকা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বিবেচনা করা যেতে পারে:

- শিশুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্কুলে নিয়মিত চাইল্ড কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। যেখানে তারা তাদের মতামত দিতে পারে এবং শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে।
- স্কুলগুলিতে শিশুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার জন্য ছাত্র পরিষদ বা ফোরাম তৈরি করা যেতে পারে, যা ছাত্রদের তাদের শিক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ, ধারণা এবং অগ্রাধিকার প্রকাশের সুযোগ দেয় এবং শিক্ষার প্রতি মালিকানা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে।
- পাঠ্যক্রমে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে শিশুরা তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ভূমিকা ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কীভাবে দাবি জানাতে হয় তা বুঝতে পারে।

- শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং স্কুল কার্যক্রমে শিশুদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা, যাতে শিক্ষা প্রাসঙ্গিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেয়।

(৭)

শিশু শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্বের দার্শনিক ভিত্তি এবং ন্যায্যতা বিভিন্ন ঐতিহ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অ্যারিস্টটলের দর্শনে সৎগুণাবলির উপর জোর প্রদান থেকে শুরু করে ফ্রেইরের মুক্তির দর্শন পর্যন্ত, বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে অভিভাবক, শিক্ষক, রাষ্ট্র এবং শিশুদের ভূমিকাকে বোঝার জন্য একটি সমৃদ্ধ ভিত্তি প্রদান করে। পারস্পরিক নির্ভরশীল অথচ প্রতিযোগিতামূলক এসব কর্তৃত্বগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে নৈতিক নীতি, সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিটি শিশুর অনন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। সমাজের বিকাশের সাথে সাথে, শিক্ষায় কর্তৃত্বের ন্যায্যতা এবং প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ একটি কেন্দ্রীয় উদ্বেগ হিসেবে থাকবে, যার জন্য অব্যাহত সংলাপ, প্রতিফলন এবং উদ্ভাবনের প্রয়োজন হবে। এই ভিত্তিগুলি বোঝার মাধ্যমে, অভিভাবক, শিশু এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা এবং খোলামেলা সংলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে যা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিক্রিয়া সংবেদনশীল এবং সকল অংশীজনের প্রয়োজন মেটাতে অধিক কার্যকর হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Archard, D. (2014). *Children: Rights and childhood*. Routledge.

Aristotle. (2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 350 BCE)

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.

Brighouse, H. (2006). *On education*. Routledge.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Callan, E. (1997). *Creating citizens: Political education and liberal democracy*. Oxford University Press.

Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson. C. J., McPaztland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & York, F. L. (1966). *Equality of educational opportunity (The Coleman Report)*. U.S. Department of Health, Education, and Welfare.

Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Kappa Delta Pi.

Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. *Phi Delta Kappan*, *76*(9), 701–712.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans., 2000 ed.). Continuum.

Gutmann, A. (1987). *Democratic education*. Princeton University Press.

Kant, I. (1998). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785)

Kant, I. (1803). *On education* (A. Churton, Trans.).

Locke, J. (1988). *Two treatises of government* (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689)

Locatelli, R. (2024). Renewing the social contract for education: Governing education as a common good. *Prospects, 54*, 315–321. https://doi.org/10.1007/s11125-023-09653-w

Mill, J. S. (1974). *On liberty* (G. Himmelfarb, Ed.). Penguin Classics. (Original work published 1859)

Montessori, M. (1949). *The absorbent mind* (C. A. Claremont, Trans., 1967 ed.). Holt, Rinehart and Winston.

Mustary, M. (2021). Policies and strategies to improve education in Bangladesh. *BCES Conference Books*.

Nussbaum, M. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.

Okello, M. (2023). The role of parents in their children's education. *African Journal of Education and Practice*, *9*(1), 27–37.

Rousseau, J. J. (1979). *Emile, or on education* (A. Bloom, Trans.). Basic Books. (Original work published 1762)

Sandel, M. J. (1996). *Democracy's discontent: America in search of a public philosophy*. Harvard University Press.

Thompson, W. (2017). Liberalism in education. *Oxford Research Encyclopedia of Education*. https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-49

United Nations. (1989). *Convention on the rights of the child*. https://www.ohchr.org

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Walzer, M. (1983). *Spheres of justice: A defense of pluralism and equality*. Basic Books.

Wingo, G. M. (1975). *Philosophies of education: An introduction*. Sterling Publishers Private Limited.

Woody, T. (1940). Principles of totalitarian education. *Proceedings of the American Philosophical Society*, *82*(1), 39–55. http://www.jstor.org/stable/984903.